দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 MAR 1986 ... ...
পৃষ্ঠা... ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

রোকেয়া হলের পঁচিশ বছর ও নারী শিক্ষা

হোসনে আরা শাহেদ

গত শনিবার ও রোববার রোকেয়া হলের দু দিনব্যাপী রজত জয়ন্তী উৎসব হয়ে গেল। দু দিনের এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান। বর্ণাঢ্য এ অনুষ্ঠানে নতুন ও পুরনো মিলে প্রায় দু হাজার ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের মত নারীশিক্ষায় পশ্চাদপদ একটি দেশে মেয়েদের একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রজত জয়ন্তী উৎসব পালন সঙ্গতভাবেই উল্লেখের দাবী রাখে। কেবল উল্লেখের নয়, ব্যাপারটি একই সঙ্গে আনন্দ প্রকাশেরও।

যদিও রজতজয়ন্তী, রোকেয়া হলের বয়স মাত্রই পঁচিশ বছর নয়। ১৯৩৮ সালে এর যাত্রা শুরু স্যার সলিমুল্লাহ ও ফজলুল হক হলের সংশ্লিষ্ট ছাত্রী হোস্টেল হিসেবে। নাম ছিল তখন উইমেনস হোস্টেল। আরও কয়েকটি নামে এর পরিচিতি ছিল—'হুদা হাউস', "চামেলি হাউস', "উইমেন স্টুডেন্টস রেসিডেনস'। ১৯৫৬ সালে 'উইমেনস হল' নাম নিয়ে এটি পূর্ণাঙ্গ ছাত্রীহলে রূপান্তরিত হয়। ১৯৬৪ সালে 'উইমেনস হল'-এর নামকরণ হয় "রোকেয়া হল'।

এককালের চামেলি হাউস, আজকের রোকেয়া হল মেয়েদের প্রথম আবাসিক হল—এ হিসেবে এর গুরুত্ব সীমাহীন। যে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে এর আত্মবিকাশ ও যে প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে এর ক্রমবিকাশ তার বিস্তারিত বর্ণনা এ মুহূর্তে সম্ভব না হলেও এ সহজেই অনুমিত। মেয়েদের শিক্ষা যে সময়ে অগ্নি-প্রশ্ন, সে সময়ে মেয়েদের হল এর মত একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে উপায় নেই। প্রায় অর্ধ শতাব্দীকালের এই প্রতিষ্ঠানটির এই উৎসব বিশেষ তাৎপর্যমন্ডিত ঠিক এ কারণেই।

রোকেয়া হলের ইতিহাস দুরন্ত ...য়ে চলার ইতিহাস। নারী-...ক্ষেত্রে এটি একটি অনন্য ও অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠান। জন্মলগ্নে এর ছাত্রীসংখ্যা ছিল মাত্র দশ কি বারো—আজ এর ছাত্রীসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন হাজার। এর মধ্যে আবাসিক ছাত্রীসংখ্যা এক হাজার। যেখানে এককালে হুদা হাউসে স্থান সংকুলান না হওয়ায় প্রভোস্ট অফিস ঠাঁই করতে হয়েছিল আজকের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ইমার্জেন্সী ভবনের একটি কক্ষে, সেখানে আজকের রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষার নেতৃত্বে আটজন পূর্ণকালীন, তিনজন খন্ডকালীন, একজন সহকারী আবাসিক শিক্ষিকা, একজন শাখা অফিসার, একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, একজন সুপারভাইজার ও দুইজন মেট্রনসহ প্রায় শতাধিক কর্মচারীর বিভিন্ন অফিস ও আলাদা আলাদা দফতরের বিরাট প্রশাসনিক কাঠামোর অবস্থান সম্ভব হচ্ছে রোকেয়া হল চত্বরেই। এককালের চামেলি হাউসে যেখানে ছিল অন্ধ প্রকোষ্ঠ, ঘিঞ্জি ঘর, অপরিসর বারান্দা, কাঁটাতারের বেড়া, সেখানে আজকের রোকেয়া হলে আছে ২২টি কক্ষ ও ৬৬টি শয্যাবিশিষ্ট নতুন ভবন, ৩৮টি কক্ষ ও ৭৪টি শয্যার অনার্স ভবন, ৯৬টি কক্ষ ও ৪০০টি শয্যাবিশিষ্ট বর্ধিত ভবন এবং সংলগ্ন বাথসহ ৭২টি কক্ষ ২৮৮টি শয্যাবিশিষ্ট প্রধান ভবন। এছাড়া আছে দুটি ডাইনিং হল, আছে কিচেন, ক্যাফেটারিয়া, ক্যান্টিন, রিডিং রুম, লাইব্রেরী। এসঙ্গে আছে সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, সেলাই, ধর্ম শিক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ, আছে রেঞ্জার অফিস, ছাত্রীসংসদ অফিস, সিকরুম, ভিজিটর্স রুম ও সুশোভন খেলার মাঠ।

যেখানে রোকেয়া হলের ছাত্রীদের পুরুষ সহপাঠীর সঙ্গে কথা বলতে প্রয়োজন হতো প্রক্টরের অনুমোদন, অন্যথায় গুণতে হতো দশ টাকা জরিমানা, সেখানে আজকের রোকেয়া হলের ছাত্রীদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে দৃপ্ত পদচারণা ও বিভিন্ন আন্তঃহল প্রতিযোগিতায় নানাবিধ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রীতিমত বিস্ময়কর। কেবল যুগ-কালের পরিবর্তনকে এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী করলে রোকেয়া হলের অবদানকে খাটো করা হবে। বাহ্যিক বিবর্তন তক্ষুণি কাজে লাগে যখন তার ভেতরের ভিত মজবুত হয়। অন্তঃসারশূন্যতায় কিছুই গড়ে ওঠে না—ঝড়োহাওয়ার কাঁপনে ধুলো হয়ে উড়ে যায়। রোকেয়া হলের ছাত্রীদের ক্ষেত্রে তা হতে পারেনি। কারণ এই হলের লক্ষ্য ছিল স্থির ও দর্শন ছিল সুগভীর। আজও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

রোকেয়া হলের অগ্রগতির কথা উল্লেখ করতে গেলে উচ্চারণ করতে হয় এর কর্ণধার মিসেস আখতার ইমামের নাম। প্রায় দেড় যুগ কাল পরম তিতিক্ষায় তিনি চালিয়ে গেছেন এর পরিচালনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম। বিকাশমান একটি নতুন হলের প্রারম্ভিক ঝাপটা তো বটেই সেই সঙ্গে রক্ষণশীল সমাজের অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীও তাঁকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল সুকৌশলে। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা ও ব্যক্তিগত সুনাম—এ দুটোকে তদানীন্তন সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ জড়িয়ে ফেলে এক নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল—তারই ফলে মেয়েদের জন্য সহশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বড় কঠিন ছিল। এই কাঠিন্যকে কাঠিন্য দিয়ে জবাব দিয়েছিলেন তৎকালীন ছাত্রী হলের প্রভোস্ট মিসেস আখতার ইমাম। রোকেয়া হল স্মরণিকায় তাঁর সম্পর্কে লিখিত হয়েছে : মিসেস আখতার ইমামের নিরলস প্রচেষ্টা ও কর্মকান্ডের ফলশ্রুতি হিসাবে গড়ে ওঠা কাঠামোর পরেই বর্তমান রোকেয়া হলের অস্তিত্ব ও অবস্থান।

মিসেস আখতার ইমামের উত্তরসূরীদের কাজেও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও অপরিসীম সহিষ্ণুতার স্বাক্ষর বিদ্যমান। রোকেয়া হলের অপ্রতিহত অগ্রগতিই এই স্বাক্ষরের প্রমাণ।

রোকেয়া হলের শিক্ষার্থীদের সফল পদচারণা পরিলক্ষিত জীবনের সুবিস্তৃত অঙ্গনে। হয়তো অনেকেই হারিয়ে গেছেন জীবনের আবর্তনে। স্তিমিত হয়ে গেছেন হয়তো কেউ কেউ বাস্তবের নিষ্পেষণে কিন্তু উজ্জ্বল হয়ে আছেন অনেকেই।

এ কারণেই রোকেয়া হলের রজত জয়ন্তীর সঙ্গে ছাত্রীদের মধ্যে (বর্তমান ও অতীতের) স্পন্দন জাগিয়েছে। অনেকেই জাগতিক ব্যস্ততা দু হাতে ঠেলে গিয়ে হাজির হয়েছেন সেই বিস্মৃত প্রায় দিনের মহাস্রোতে। অনেকে পারেননি—কিন্তু মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন সেই মিলনের মহালগ্নে।

সেই প্রাচীন জমিদার বাড়ীর ভারী কাঠের অপরূপ কারুকাজের চিহ্নমাত্র আজ নেই। নেই শিরীষ-কৃষ্ণচূড়ার বর্ণালি সমাহার নেই কাচে ঘেরা সেই খাবার ঘর আর ফুটে থাকা বিভোর ডালিয়া। এর পরিবর্ধন পরিশীলন, পরিবর্তনের আবর্তে আজকের রোকেয়া হল। সেখানে আজ সুউচ্চ দালান সুবিস্তৃত মাঠ—ছায়াঘেরা পুকুরটিও আজ বিলীন। আজ অনেক আছের মধ্যেও মনে বড় হয়ে ধরা দেয় অনেক নেইকে, তাই যদি কেউ রোকেয়া হলের দোর প্রান্তে গিয়ে থমকে যান অথবা চশমার বাষ্পে পথ হারান দোষ দেয়া যাবে না তাঁকে। তবে একই সঙ্গে মন-কেমন-করা ঝেড়ে ফেলতে হবে। কেননা প্রগতির শর্ত এগিয়ে চলা. রোকেয়া হলকে আরও এগোতে হবে। এগোতে হবে তার ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত ধারা অব্যাহত রেখে।